আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের অর্ধশতবর্ষের আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা (১৯২১-১৯৭১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে
'পি. এইচ. ডি.' উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ।

গবেষণা পত্রের সারাংশ

গবেষক ঃ **প্রবাল সেনগুপ্ত**

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঃ AOOHI1101216 (2016-17)
রোল নাম্বার ঃ PHD/HISTORY/16-45
F. I. No.-294/16/Arts.

গবেষণা অবেক্ষক
ড. দেবজিত দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২০২২

সারাংশ

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে বা আমাদের বাংলায় শিক্ষাকে একটি ‘সেবা’ হিসাবে গণ্য করা হলেও, শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য, শিক্ষান্তে গুরু দক্ষিণা গ্রহণ করতেন। অনেক সময়ই শাসক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করতেন তারা। কিন্তু ‘পরবর্তী মধ্যযুগের’ সময় থেকেই শিক্ষা দানকে একটি ‘ব্রত’ হিসাবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গুরু দ্রোণাচার্যের গুরুতর গুরুদক্ষিণা আদায় করার বদলে আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় ‘বুনো রামনাথের ‘অর্থহীন’ জীবনযাপন। ঔপনিবেশিক যুগেও চিকিৎসক থেকে শুরু করে আইনজীবী বা প্রযুক্তিবিদেরা তাঁদের ‘সেবার’ পরিবর্থে প্রভুত অর্থ উপার্জন করলেও, শিক্ষকতার ব্রতর সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, শিক্ষকবৃন্দও সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক দাবিগুলি তুলতে চেষ্টা করতেন না। বাংলার ‘নবজাগরণ’কালীন সময়ে আধুনিক ‘স্কুল’ ধাঁচের ‘সংঘবদ্ধ শিক্ষকতা’ প্রচলিত হলেও এই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

১৯১৫-এর পর নানা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশ্য উপরোক্ত মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হল। গড়ে উঠতে শুরু করল সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলন। আমরা আমাদের গবেষণায় শিক্ষক সমাজের এই মানসিকতা পরিবর্তনের কারণ, তৎপ্রসূত কার্যকলাপের এক বিস্তৃত ধারাবাহিক আলোচনা করতেই প্রবৃত্ত হয়েছি বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে। এর পাশাপাশি বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছি তাদের আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন বাঁকের পরিবর্তন ও আঙ্গিকগত রূপান্তরের। মূল আলোচনায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রথম সংগঠিত সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ঔপনিবেশিক পর্বের ও ঔপনিবেশিকোত্তর যুগের আন্দোলনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের সাক্ষী থাকতে চেয়েছি আমরা।

এই গবেষণা নিবন্ধের কর্মপরিকল্পনা ও তাৎপর্য নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা দেখতে চেয়েছি, মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেন্দ্রিক এই আন্দোলন এর ধারাবাহিকতা ও রূপান্তরের সম্বন্ধে অ্যাকাডেমিক আলোচনার অভাব কীভাবে পরিপূরণ করা যায়।

আমরা এই কাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি যে মূলতঃ এই আন্দোলন নিরিহ শিক্ষকদের নম্র আবেদনমূলক পর্যায়কে অতিক্রম করে কীভাবে অন্যান্য শ্রেণির আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে পরবর্তীকালে দুর্বার গণ আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁদের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতার কারণ স্বরূপই তা হয়তো অত্যাশ্চর্য ছিল না। কিন্তু আন্দোলনের একটি পর্বে অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে

শ্রমিক শ্রেণির সংঘর্ষের সঙ্গে তাঁদের মেলবন্ধন আমাদের আশ্চর্য না করে পারে না। শিক্ষকতার 'ব্রত' ও জীবিকার মধ্যে সাযুজ্য স্থাপন করতে শিক্ষকরা সফলতা পেয়েছিলেন কীভাবে, তাও আমাদের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।

এখানে আমরা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে এক্ষেত্রে 'পূর্ববর্তী গবেষণা কর্মের মূল্যায়ন' করার সে রকম কোনো সুযোগ আমরা পাইনি। শিক্ষকদের সংগঠন তাঁদের পত্রপত্রিকায় ও দলিলে অনেক আকর তথ্য পেশ করলেও, সুবিন্যস্তভাবে সামগ্রিক শিক্ষক আন্দোলনকে একটি মুকুরে ধরবার কোনো চেষ্টা—বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হয়নি বলেই আমরা জানি।

গবেষণার প্রাথমিক পর্বে আপাত অজানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মুখ্য ও গৌণ উপাদানসমূহের সাহায্যে আলো ফেলতে গিয়ে, নানা প্রশ্নের উদয় ও তার সমাধানের চিন্তা পর্যায়ক্রমে আমাদের মননে ও কলমে এসেছে। কীভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হলেন। এর পিছনে সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব, শিক্ষক মনস্তত্ত্ব, বাইরের রাজনীতির সঙ্গে তাদের যোগ, শিক্ষক আন্দোলনে 'ব্যক্তিবৃন্দের' বিশেষ ভূমিকা, মধ্যশ্রেণির অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সংযোগ, বিভিন্ন সরকারগুলি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব, আমাদের ভাবনাকে উস্‌কে দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি, সাধ্যমতো তার সমাধান করতে। গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা সংগঠিত মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের কালানুক্রমিক ও বিষয় ভিত্তিক মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। উৎস হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি সাংগঠনিক পত্র পত্রিকা, সরকারি নথি, স্মৃতিচারণ ও আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত প্রবন্ধ নিবন্ধ, সমকালীন সংবাদপত্র, আইনসভার কার্যবিবরণী প্রভৃতি।

এবার আসি গবেষণা প্রকল্পটির বিভাজন প্রসঙ্গে। ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া, সমস্ত বিষয়টি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে, পরিবেশনের চেষ্টা করেছি আমরা। নিম্নে তার নাতিবৃহৎ বর্ণনা সন্নিবেশিত হল।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, যে শিক্ষাদান একটি সেবাকার্য। তাই অন্যান্য পেশার মতো শিক্ষকদের 'শিক্ষা দান' একটি সেবাকার্য—জীবিকা নয়। অন্যান্য পেশার মতো তাই টাকা-আনা-পাই পয়সার হিসাব করা শিক্ষকের শোভা পায় না। বশিষ্ঠ থেকে 'তিন্তিরি বৃক্ষের পত্রের ঝোল' খাওয়া বুনো রামনাথের প্রসঙ্গ এ প্রসঙ্গে আমরা স্বতঃই শুনতে পাই, এমনকি আজকের দিনেও।

ইতিহাস নিঃসৃত বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে। বৈদিক যুগের বই-পুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি, যে সেই যুগে শিক্ষক-গুরুরা, বিদ্যাদানের মাধ্যমে অর্থ-দ্রব্য সামগ্রী উপার্জনে যথেষ্ট আগ্রহশীল ছিলেন। 'অপরা বিদ্যা' অথবা 'ব্রহ্মসত্য/জগৎ মিথ্যা'র শিক্ষা তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চালিত করলেও, নিজেদের পার্থিব জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা আদায় করতেন। দ্রোণের গুরুতর গুরুদক্ষিণা আদায়ের

কথা এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি। এছাড়া শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের গুরুর জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমদান, যথা সমিধ স্বরূপ কাষ্ঠ আহরণ, শষ্য ক্ষেত্রে কৃষি কাজে সহায়তা করতে হত তাঁদের। এ প্রসঙ্গে উদ্দালক পুত্র আরুণির গুরুর ক্ষেতের জল আটকানোর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা আমরা স্বতঃই মনে করতে পারি।

আচার্য শ্রেণির কিছু শিক্ষক ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদান করলেও, তারা সাধারণতঃ স্থানীয় শাসকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করতেন ও তার দ্বারাই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হত। এর বিপরীতে 'উপাধ্যায় শ্রেণির শিক্ষকেরা কড়ায় গণ্ডায় অর্থ গ্রহণান্তেই বিদ্যা দান করতে প্রবৃত্ত হতেন।

তাই বলে, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক সেই সময়ে স্বার্থের বন্ধনেই আবদ্ধ ছিল একথা মনে করলে ভুল হবে। তাদের ব্যবহারিক কাজে গুরুরা শিষ্যদের সাহায্য নিলেও, তাঁরা নিজ নিজ গৃহে যত্নের সঙ্গেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন।

পরবর্তী বৌদ্ধ যুগে শিক্ষাদান ব্যক্তিগত গুরুর আশ্রমের গণ্ডী অতিক্রম করে কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁরাও কিন্তু 'মাধুকরী' ছাড়াও দেশের শাসকবর্গের দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতে মধ্যযুগে মুসলিম সংস্কৃতির অনুসারী মাদ্রাসা-মুক্তবের সঙ্গে যুক্ত 'ওস্তাদ ও তালিবান'-রাও রাজ অনুগ্রহের অর্থ সাহায্যেই নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করত। এর পরে বিশেষ করে আমাদের বাংলায় 'পরবর্তী মধ্যযুগে' শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাধারার বর্ণনা ও শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে, বাংলা রামায়ণ-মহাভারত, চৈতন্য সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যের আলোয় আলোচনা করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। এই অধ্যায়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের পাঠশালা শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। আধুনিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক সংগ্রামের নান্দিমুখ হিসাবেই **প্রথম অধ্যায়টি** রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে প্রাথমিক পর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক উদাসীনতা ও তার পাশাপাশি 'নতুন যুগের ভোরে' নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির জন্যই 'ইংরাজী শিক্ষার জন্য' ভারতে উদীয়মান কম্প্রাদর শ্রেণির উদগ্র উৎসাহ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তখনও সংগঠিত ভাবে 'বিদ্যালয়সমূহের উদ্ভব না হলেও, ডেভিড ড্রামন্ড প্রমুখের ইংরাজী পাঠশালার' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষ করে কলকাতার নব্য ধনী সমাজের সন্তানেরা এই সকল ব্যক্তি গুরুর পাঠশালায় ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

এই সময়ই সংগঠিত ভাবে স্কুল বা বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে, অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ভারতে আগত খ্রিস্টান মিশনারীরা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পিছনে তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাকুন না কেন, বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক সমন্বয়ে আধুনিক স্কুল ব্যবস্থা স্থাপন তাঁরাই করেছিলেন, ভারতবর্ষ বলা ভালো দেশের স্নায়ুকেন্দ্র বাংলায়। হুগলীর শ্রীরামপুর থেকে শিক্ষার যে দীপ তাঁরা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের

বাংলার কলকাতা সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। প্রথাগত পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা।

এর পাশাপাশি বক্ষমান অধ্যায়ে বাংলার নবজাগরণ সম্ভুত বুদ্ধিজীবীকুলের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সচেতনতামূলক কাজকর্ম আমরা আলোচনায় এনেছি। রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ভারত প্রেমিক ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টার কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। মূলতঃ এঁদেরই উৎসাহে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র 'হিন্দু কলেজের' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। বাংলায় এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের শুভ সূচনা হয়েছিল। শিক্ষাদানের বিনিময়ে শিক্ষকদের বেতন দানের প্রথাও প্রচলিত হয়েছিল এই সময়ে। শিক্ষাদান কার্যকে এইভাবে 'ব্রত ও বৃত্তির' সমন্বয়ে গড়ে তোলার সূচনা হয়েছিল এই সময়েই। কিছু পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই-এর শিক্ষা সংস্কারে, শিক্ষাকার্যে ব্রত ও বৃত্তির' এই সমন্বয় সাধন সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়েছিল।

এদিকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে এতদিনকার উদাসীনতা মুক্ত হয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের দ্বন্দ্বে, সেই টাকা বছরের পর বছর অব্যবহৃত থাকার পরে শেষ পর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট বেথুন এবং তাঁর সহযোগী টমাস মেকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উপরোক্ত অর্থ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগরে ইংরাজী শিক্ষার কলেজ বা আদতে স্কুল স্থাপিত হতে শুরু করে এই সময় পর্বে। নির্দিষ্ট বেতনের পরিবর্তে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপক প্রসারও সূচিত হয় স্বাভাবিক ভাবেই।

১৮৫৬-এর 'উডের ডেসপ্যাচের' সুপারিশ অনুযায়ী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়—শিক্ষার বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার তড়িৎ গতিতে উন্নতি শুরু হয়েছিল এই সময়েই। ১৮৫০-এর দশকে যেখানে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল ১৬৯টি, সেখানে ১৮৮০-এর দশকে সেই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ১৩৬৩টিতে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উপজাত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকৎও আমরা এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছি। বিকল্প জাতীয় শিক্ষার এই ধারা, প্রাথমিক পর্বে যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও, জীবিকার ক্ষেত্রে বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে অপারগ হবার ফলে শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষাধারার প্রায় অবলুপ্তি ঘটে। তবে আদর্শ শিক্ষার ধারা কেমন হওয়া উচিৎ, তার একটি দিক নির্দেশ এই শিক্ষাধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থাতেও শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যকে শুধু ব্রত-এর বেড়াজালে আবদ্ধ না রেখে, তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বেতন দানের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

এর পরবর্তীকালে বিদেশি শিক্ষা কাঠামোকে ব্যবহার করে, স্বদেশ উন্নতির কাজে ব্যবহার করতে বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত রূপকার স্যার আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়। তাঁর আমলে শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। স্কুল স্তরের পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল প্রতিস্থাপনের জন্য ম্যানেজিং কমিটির সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখি। সমসময়ে রেনেসাঁ যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ বা যদুনাথ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক সুফল এবং আলোচনার কথা এ প্রসঙ্গে ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়।

নবজাগরণের যুগের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিন্তার আলোচনা ছাড়া বর্তমান অধ্যায় অপূর্ণ থেকে যাবে। প্রথাগত স্কুল কলেজ শিক্ষা বিমুখ রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষকতা, নিয়ে যেমন ভেবেছেন অনেক, সেই ভাবনাকে কার্যে পরিণত করতে খেটেছেন ততোধিক। প্রথমে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্বদেশি শিক্ষা ধারা ও পরবর্তীতে শান্তিনিকেতন পর্বে একদিকে তিনি যেমন আদর্শ শিক্ষা পরিবেশ স্থাপন ও আদর্শ শিক্ষকের সন্ধানে তৎপর থেকেছেন, তেমনি ‘ব্রত’ হিসাবে শিক্ষকতার আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সর্বদা। ‘প্লেইন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং’ এ বিশ্বাসী হলেও, শিক্ষকদের ন্যূনতম পার্থিব প্রয়োজন পরিপূরণের প্রতি তিনি পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন না। তাই আদর্শ শিক্ষক ব্রত ধারী সতীশচন্দ্র রায়ের অজান্তেই, তার পিতাকে নিয়মিত ‘অর্থ’ প্রেরণ করাকে তিনি কর্তব্য হিসাবেই জ্ঞান করতেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতবর্ষের তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের এক বিরাট পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল। একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ধারায়ও সাম্যের সামগান শোনাল সারা বিশ্বকে। দেশেও আবির্ভূত হল গান্ধীজীর ‘রামরাজ্যে’র রামধুন। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাও হল এই পর্বে। বাংলায় গান্ধীজীর ‘ডানহাত’ হিসাবে আন্দোলনের রথের রশি হাতে নিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শুধুমাত্র ব্যবহারিক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়—শিক্ষা সম্বন্ধেও চিত্তরঞ্জনের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ছিল। অনাড়ম্বর শিক্ষাধারারই সমর্থক ছিলেন তিনি। তথাকথিত স্কুল শিক্ষা কাঠামোর বিরোধিতা না করলেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষা ক্ষেত্রেও অন্ধ অনুকরণের বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর এই মনোভাবের দ্বারা তৎকালীন শিক্ষকেরা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিক্ষকরা ‘ম্যানেজিং কমিটি’ বা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরোধিতার ভয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশ না নিলেও, আন্দোলনে প্রচুর শিক্ষক ‘ব্যক্তিগত’ ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। হুগলীর ‘মাষ্টারমশাই’ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ থেকে, চট্টগ্রামের ‘মাষ্টারদা’ সূর্য সেন তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

আমরা আমাদের গবেষণা নিবন্ধের **তৃতীয় অধ্যায়,** উপরোক্ত আলোচনার মধ্য দিয়েই শুরু করেছি। আগেই আলোচিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকরা শ্রেণি হিসাবে নয়—একটি মধ্যবিত্ত চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। একদিকে শিক্ষকবৃন্দের অসহনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং অন্য

দিকে শিক্ষা কাঠামোর জীর্ণ দশার পরিবর্তনের লক্ষ্যেই প্রধান শিক্ষক হেমদাকান্ত চৌধুরী, ঈশান চন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ বাইশজন শিক্ষকের নেতৃত্বে ১৯২১-এ গঠিত হয় শিক্ষাধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন—নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা 'ABTA'। সংগঠনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় 'শিক্ষকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসারণ ঘটানো ও শিক্ষকতা বৃত্তিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা'। তবে এর পাশাপাশি সমিতির মুখপত্রের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, 'শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতির উপায় কি' শীর্ষক নিবন্ধ।

সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি সমিতিকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য' সাংবিধানিক পরিসরের মধ্যে শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক ও আর্থিক দাবিসমূহ পরিপূরণের জন্য আন্দোলনের কথা বলেছিল বারেবার। তা সত্ত্বেও, সে কথা, কথার কথাই হয়ে থেকেছিল, স্বাধীনতা পূর্ব সমিতি জীবনে। ১৯২১ থেকে ৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই সমিতির বার্ষিক অধিবেশন বসলেও এবং সেখানে 'শিক্ষা ধারা ও শিক্ষকতার বৃত্তিকে মহনীয় করার কথা বলা হলেও, রাস্তায় নেমে আন্দোলনের কথা তখন শিক্ষকদের কাছে আকাশকুসুম কল্পনা হয়েই ছিল। তবু শিক্ষকদের অত্যল্প হলেও, বেতন বৃদ্ধি, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক বিনা কারণে কিংবা গৌণ কারণে শিক্ষকদের বরখাস্তকরণ রোধ, প্রাথমিক ভাবে 'স্কুল কোড' প্রণয়নের জন্য শিক্ষা বিভাগকে রাজি করানো, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি যে আংশিক সাফল্য পেয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর পাশাপাশি অল্পাধিক বিভিন্ন জেলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে সমিতির প্রভাব যে ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হচ্ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই আপাত নিস্তরঙ্গ সমিতির কার্যধারার সলিলে উত্তেজনার উন্মেষ ঘটেছিল, ১৯৩০-এর দশকের শেষার্ধে। সেই সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তচ্যুত করে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নামে একটি স্বশাসিত পরিষদের পরিচালনায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন বাংলার মসনদে কৃষক প্রজাপার্টি ও মুসলিম লিগের কোয়ালিশন সরকার বিরাজমান। তারা প্রস্তাবিত পর্ষদে জনসংখ্যার নিরিখে কিছু বেশি সংখ্যায় মুসলিম সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করলে বাংলার বেশির ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বর্ণ হিন্দু নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়ে। তখন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিও তাদের নিম্নবিত্ত শ্রেণিচেতনাকে দূরে ঠেলে, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার শরিক হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের আজীবন অরি, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও স্কুলের শিক্ষকদের দাবিসমূহের বিরোধী উচ্চবিত্ত প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষ অবলম্বন করে। এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে আমরা শিক্ষক সমিতির চন্দ্রকলার কলঙ্ক হিসাবেই গণ্য করতে পারি।

যাইহোক, বর্তমান অধ্যায়ে ১৯৪০-এর দশকে, সমিতির চরিত্রের ক্রমশ পরিবর্তনের একটি চালচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টাও করা হয়েছে। এই সময়ে সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক-সামাজিক

ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কু-প্রভাব জনগণের অন্যান্য অংশের মতো শিক্ষক জীবনকে আবিল করে তুলেছিল। যার সদর্থক ও নঞর্থক প্রভাবের পরিচয় আমরা সমসাময়িক সাহিত্যেও পড়তে দেখি। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্তন' ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসদ্বয়ের উল্লেখ করতে পারি। প্রসঙ্গক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পের কথাও মনে পড়ে যায়। যাইহোক কালান্তক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ও মিত্রপক্ষের জয় ও ৪২-এর আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগ ও নৌ বিদ্রোহ ইত্যাদির ফলে ভীত ঔপনিবেশিক সরকার দেশত্যাগ করতে উদ্যত হলে, হত দরিদ্র শিক্ষকরা নতুন করে রাজপথের রণাঙ্গনে নামতে উৎসুক হয়ে ওঠে। ১৯৪৫-এ ভারত সভা হলে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের এক কনভেনশনে এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল।

আমাদের নিবন্ধের **চতুর্থ অধ্যায়ে** আমরা দেশের স্বাধীনোত্তর কালে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করেছি। অত্যল্প বেতনের শিক্ষকেরা, ভেবেছিলেন যে স্বাধীনোত্তর দেশের তথা রাজ্যের সরকার, তাঁদের এতদিনকার বঞ্চনার প্রতিকার করবেন। বাস্তবে তা কিন্তু সাকার হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ড. মেঘনাদ সাহা শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানালেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সমিতিও আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করল। সমিতির জীবনে আসল নতুন পর্যায়। সেই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু মানুষের আগমন হতে থাকল—এই মানুষেরা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের পাশাপাশি নিজেদের সন্তান সন্ততিদের জন্য শিক্ষালয় গড়ে তুলতে যত্নবান হলে, শিক্ষক সমিতির সংগ্রাম মুখীনতা আরো জোরদার হয়ে উঠল। 'নতুন ইহুদি'রা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকেই তাঁদের শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করল।

এদিকে আমাদের বিভক্ত বঙ্গের পশ্চিম পার তখন জন বিক্ষোভে উত্তাল, শ্রমিকদের বিভিন্ন আন্দোলনের পাশাপাশি ডাক ও তার দফ্‌তর, ট্রামশ্রমিক, উদ্বাস্তু, ছাত্র-যুব-মহিলা আন্দোলনে উত্তাল বাংলা। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমিতির একটি বড় অংশ নিজেদের দাবি দাওয়া আদায় করার মানসে, প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পক্ষপাতী হলেও, সমিতির পুরনো নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্ব তাতে অরাজি। এদিকে ৪৭' খ্রিস্টাব্দ এসে পড়ল। ভারত একই সঙ্গে হল স্বাধীন ও বিভক্ত। নতুন সরকার অবশ্য শিক্ষকদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে উদাসীনতা প্রদর্শন করল। এই রকম পরিস্থিতিতে সমিতির মধ্যেই সংগ্রামশীল নেতৃত্বদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠল। এদের মুখ হলেন শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধা রায়, অনিলা দেবী প্রমুখ। আর নেতাদের নেতা হিসাবে নতুন প্রজন্মের আন্দোলনের রশি হাতে নিলেন কলকাতার কালিধন ইনস্টটিউশনের কর্ণধার সত্যপ্রিয় রায়। বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা, অন্যায় ভাবে শিক্ষক ছাঁটাই এর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের বেতন হ্রাস, শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দের দাবি তুললেন তাঁরা। ১৯৪৮ প্রথম সর্মবিরতি করলেন শিক্ষকেরা তাঁদেরই নেতৃত্বে। নানা টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী নেতৃত্ব, রক্ষণশীলদের

সরিয়ে দিয়ে সমিতির নেতৃত্বে আসীন হলেন। নতুন 'স্কুল কোড'-এর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তাদের পথচলা শুরু হল।

এদিকে তখন ভারত সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে রামস্বামী মুদালিয়ার এর নেতৃত্বে মুদালিয়ার কমিশন গঠন করেছে। শুধুমাত্র রাস্তার আন্দোলন নয়—এই কমিশনের প্রেরিত প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর দিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তার গঠনমূলক ভূমিকাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সমিতি আশা করেছিল, এই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী শিক্ষকদের আর্থ-রাজনৈতিক চাহিদার পরিপূরণ ঘটবে। বিশেষ করে সমযোগ্যতার সরকারী কর্মচারীদের সমতুল্য বেতনের দাবি তাঁরা তুলেছিলেন। কিন্তু তাদের সেই আশা পরবর্তীতে ফলপ্রসূ হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে সমিতির সংগ্রামমুখী অংশটির নেতৃত্ব, শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ২০% ব্যয়, শিক্ষকদের ন্যূনতম দুইশো টাকা মাসিক বেতন এবং পঁয়ত্রিশ টাকা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৫৩-এ সমিতির চুঁচুড়া সম্মেলনে, শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিসমূহ না মিটলে ৫৪' এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অনির্দিষ্ট কালীন কর্মবিরতির প্রস্তাব নিলেন সমিতির সদস্যরা। চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে প্রায় একবছর অর্থাৎ ৫৩-এর আগস্ট মাস থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করে জনমত গঠনের চেষ্টা শুরু করল শিক্ষক সমিতি। জেলায় জেলায় স্থানীয় স্তরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল আসন্ন সংগ্রামের। উদ্বাস্তু, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব মহিলা সমস্ত অংশের জনগণের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হলেন শিক্ষকেরা। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরও আন্তরিক সহযোগিতা পেলেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন ডা. বিধান চন্দ্র রায়। তিনি শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু প্রস্তাব দিলেও, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাছে, তা গ্রহণযোগ্য হল না। ১৯৫৪-এর ১০ই ফেব্রুয়ারি, শুরু হল শিক্ষকদের ঐতিহাসিক বারো দিনের আন্দোলন ও কর্মবিরতি। রাজ্যের জনগণ ব্যাপক ভাবে সাড়া দিল এই আন্দোলনে। মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত বিরোধী দলের সমর্থন পেলেন শিক্ষকেরা। বিধানসভার ভেতরে-বাইরে বিরোধী সদস্যরা তাঁদের দাবির সমর্থনে স্বোচ্চার হয়ে উঠলেন। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বিরোধী নেতা জ্যোতি বসুর ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বল প্রয়োগ করে আন্দোলনকে পিছু হঠতে বাধ্য করল তদানীন্তন সরকার। তবে শুধুমাত্র রাজ্যের বিধানসভা/পরিষদ নয়, দেশের লোকসভা ও রাজ্যসভাতেও, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠেছিল। সংবাদ মাধ্যমেও বহুল প্রচার পেয়েছিলেন, শিক্ষক সংগ্রামের সারথীরা। বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংগঠনগুলি আমাদের রাজ্যের শিক্ষক সংগ্রামে সহমর্মীতা জ্ঞাপন করেছিল। এইভাবে তখনও অবধি সব দলমতের শিক্ষকদের সাধারণ আন্দোলনের মঞ্চ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসঙ্গত শুধু কোলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির প্রত্যন্ত প্রান্তের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অঙ্গনেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র মাঠে ময়দানের সংগ্রাম নয়—নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষকেরা বাইরের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে

সচেষ্ট হয়েছিল। নানা দেশের শিক্ষক সংগ্রামের আলোয় নিজেদের গতিপথ চিনে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা।

গবেষণা নিবন্ধের **পঞ্চম অধ্যায়ে** মূলতঃ আমরা ৫৪-এর পরবর্তীকালে শিক্ষক আন্দোলনের গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তন ও বিশ্ব শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এছাড়া সত্যপ্রিয় রায়/অনিলা দেবী সহ সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষক আন্দোলন যে গতিময়তার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি আমরা। দেশের ভিতরের বিভিন্ন রাজ্যের ও বিদেশের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও এই নেতাদের বিশেষ করে সত্যপ্রিয় রায়ের চেষ্টায় সম্পন্ন হয়েছিল তার বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে অধ্যায়টিতে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ৫৪-এর স্মরণীয় সংগ্রামের পরও, ৫৮ তেও শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। আসলে, ‘সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম’ তত্ত্বে বিশ্বাসী শিক্ষক সমিতির সুকৌশলী নেতৃত্ব আরেকটি বড়ো আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই সময়।

১৯৬২তে চিন-ভারত সীমানা সংঘর্ষ নিয়েও সমিতির বিরুদ্ধে কুৎসা করা হয়েছিল। তাদের দেশ বিরোধী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করার একটা চেষ্টা কিছু দলছুট গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষকরা করেছিলেন—তৎকালীন সরকারের মদতে। অবশ্য তৎকালীন বিধান পরিষদের অন্যতম শিক্ষক প্রতিনিধি অনিলা দেবীর বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে শিক্ষক সমিতি ‘দেশ বিরোধী’ তো নয়ই, অনেকের থেকেই বেশি স্বদেশ প্রেমিক। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের মদতপুষ্ট হয়ে, কতিপয় প্রধান শিক্ষকদের আণুবীক্ষণিক সংগঠন ‘প্রধান শিক্ষক সমিতি’ ও ৫৪ এর পরবর্তী কালে সরকারের পক্ষপাতী কিছু শিক্ষক গোষ্ঠী, জাল নির্বাচনের মাধ্যমে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে, শিক্ষক আন্দোলনের মূল ধারার প্রতিনিধি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রার্থীদের পরাজিত করেছিল। এই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই পরবর্তীকালে ১৯৬৬-এর শিক্ষক সংগ্রামের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল।

এদিকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার সর্বস্তরের সমস্যা-সম্ভাবনা-সমাধানের লক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কোঠারী কমিশন’ গঠন করেন। শিক্ষক সমিতি সব সময়ই গঠনমূলক কাজে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করত। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কি প্রক্রিয়ায় সমিতির সর্বজনমান্য নেতা সত্যপ্রিয় রায় বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির নানা পন্থা কমিশনের সামনে তুলে ধরেছিলেন তার বিশদ বর্ণনা করতে চেয়েছি। অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে অনেক গালভরা কথা লিপিবদ্ধ করলেও, বাস্তবের মাটিতে কোঠারী কমিশনের শিক্ষাচিন্তার বীজ কোনো ফল দান করতে ব্যর্থ হয়েছিল—এটা বলা যেতেই পারে।

এল ১৯৬৬। অর্থনৈতিক দৈন্য তখন রাজ্যকে প্রায় সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। শুরু হয়েছে খাদ্য আন্দোলন। শিক্ষক সমাজও স্বভাবতঃই সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটের নিরসন কল্পে আন্দোলন ছাড়া গতি নেই। এই চেতনা শিক্ষক সহ মধ্যবিত্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা সেই সময় অনুভব

করতে সক্ষম হয়েছিল। একত্রে সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল 'শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি', যা সাধারণ্যে ১২ই জুলাই কমিটি বলেই খ্যাত। এই সমষ্টিগত সমর্থনের জোরেই ১৯৬৬-এর শিক্ষক সমিতির বর্ধমান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য বাজেটের ২০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করণের, শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষাদানের ও শিক্ষকদের নতুন বেতনক্রম প্রচলনের জন্য আন্দোলনে নামলেন মাধ্যমিক শিক্ষকেরা। সরকার তাদের দাবিসমূহের প্রতি সহানুভূতি তো দেখালেন না-ই, বরঞ্চ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে, আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙতে তৎপরতা দেখাতে শুরু করলেন। এই পরিস্থিতিতে নেতৃবৃন্দ আন্দোলন স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন। তবে আমাদের 'গুরুকুল' বুঝলেন যে বর্তমান সরকারের মসনদ উল্টে না দিলে, কোনোভাবেই তাঁদের দাবিসমূহ পরিপূরণের সম্ভাবনা নেই। তাই এবার তাঁদের শ্লোগান হল, 'Oust this Government to win a Progressive Educational Policy'। এর ফল কি হয়েছিল তা আলোচনার পূর্বে আমরা শুধুমাত্র রাজপথে নয়—যুগে যুগে সাহিত্যিকদের কলমে শিক্ষকদের সংগ্রামের কি চিত্র ফুটে উঠেছিল, সে সম্বন্ধেও বর্তমান অধ্যায়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছি। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর হয়ে শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে মুজতবা আলি, সকলের লেখাতেই বারে বারে আমাদের শিক্ষক সমাজের সংকটের কথা ফুটে উঠেছে—কখনো কখনো, কিছু শিক্ষকের নঞর্থক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও যে ফুটে বেরোয়নি এমনটাও নয়। গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি কবিরাও শিক্ষক সংগ্রামের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাঁদের একজনের কলমেই লেখা হয়েছিল, 'তোমরা দিয়েছ শিক্ষা, যে শিক্ষায় কলম ধরেছি, অন্যায় প্রতিবাদে/আজ যদি থাকি নির্বিকার তোমাদের ধর্মঘটে/তোমাদের জীবন সংগ্রামে/তবে মাথায় পড়ুক বজ্রাঘাত।' একটি উদাহরণেই কবি কুলের শিক্ষকদের সম্বন্ধে সামগ্রিক মনোভাবের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। পাশাপাশি নাটকে, গানে, শিক্ষকদের সংগ্রামের স্বপক্ষে সেই সময় স্বোচ্চার হয়েছিলেন সর্বক্ষেত্রের সুশীল সমাজ। এমনকি শিক্ষকদের নিজস্ব মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য' এর পাতায়ও তার প্রচুর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

এরপরে শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকাদের বিশেষ অবদানের কথা আমরা '....অর্ধেক আকাশ' এই উপশিরোনামে এই অধ্যায়েই আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি। আমাদের দেশে 'কেরাণী তৈরির শিক্ষা'-র যে পরিকাঠামো ঔপনিবেশিক সরকার তৈরি করেছিল তাতে নারী শিক্ষার প্রতি, অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করেই কোনো দৃষ্টি সে ভাবে দেওয়া হয়নি। রেনেসাঁ প্রসূত বুদ্ধিজীবী সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে 'স্ত্রী শিক্ষার' কথা ভাবলেও, তার পিছনে 'যোগ্য সহধর্মিণী' হিসাবে নারীকুলকে গড়ে তোলার ইচ্ছাই প্রকটিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে এবং স্বাধীনোত্তর যুগে নতুন যুগের সূচনায় পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীরাও এতদিনকার পুরুষ অধ্যুষিত কর্মক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ করতে শুরু করে। বিশেষ করে উদ্বাস্তু নারীরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষকতা পেশায়ও প্রবেশ করেন মহিলাবৃন্দ। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা আন্দোলনেও যোগদান করেন তাঁরা। ৫৪ এবং ৬৬-এর শিক্ষক আন্দোলনে

তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা অনিলা দেবী, সুধা রায়-এর মতো প্রথম সারির নেত্রীদের পাশাপাশি মায়া চক্রবর্তী, মীরা চট্টোপাধ্যায়ের মতো মধ্যম পর্যায়ের নেত্রীদের নাম উদাহরণ হিসাবে করতেই পারি। সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের এই উত্থান, শিক্ষক সমিতিকে সার্বিকভাবে ঋদ্ধ করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আলোচনার **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** আমরা মূলতঃ শিক্ষক সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের সাধারণ মানুষের রোষ কীভাবে স্বাধীনোত্তর যুগের পর ১৯৬৭-এ কংগ্রেস সরকারের পতন ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের উত্থানকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই সরকার প্রথম থেকেই নানা অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের শিকার হলেও, শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীদের সমমর্যাদা দিয়েছিল 'শিক্ষক মিত্র' এই সরকারই। এই সময় তথাকথিত বামপন্থী প্রভাবিত এই সরকার শিক্ষকদের অনেক দিনের বহু দাবি মেনে নিয়েছিল। বেতন হারের পুনঃবিন্যাস, শিক্ষকদের 'পে-কমিশনের অন্তর্ভুক্তিকরণ' সহ শিক্ষকদের এতদিনকার 'স্বপ্নসমূহকে সাকার করেছিল এই সরকার। সরকারি সহায়তায় শিক্ষক সমিতি নিজস্ব শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ গঠন করতেও সমর্থ হয়েছিল এই সময়। খুব শীঘ্রই এই সরকারের পতন ঘটলেও পরবর্তী নির্বাচনে আবার ফিরে এসেছিল যুক্তফ্রন্ট। নতুন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন তৎকালীন অবিসংবাদিত শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়। নতুন সরকারের বত্রিশ দফা কর্মসূচির দশ নম্বরেই শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের সুদৃঢ় ঘোষণা করেছিল যুক্তফ্রন্ট। সত্যপ্রিয় রায়, শিক্ষামন্ত্রী হয়েই শিক্ষকদের বেতন-ভাতার বৃদ্ধি, অন্যায়ভাবে তাঁদের তখন ছাঁটাই করার নীতি রদ, শিক্ষা প্রশাসনে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তবে আমরা আমাদের আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি যে শিক্ষক সমিতির সঙ্গে বাম প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের মৈত্রী সম্পর্কের ফলে শিক্ষকেরা একদিকে যেমন আর্থ-রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হয়েছিল, তেমনি নঞর্থক দিক থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এতদিনকার দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষকদের সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বামপন্থীদের বিশেষ করে তাদের বড়ো শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন হয়ে উঠেছিল ক্রমশঃ। বিশেষ করে সমিতির নেতৃত্বে তখন থেকেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 'শিক্ষক সদস্যেরা' সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে শুরু করার ফলে, শিক্ষক সমিতির বহুধা বিভক্ত হবার 'শেষের শুরু'র সেই সময়েই সূচনা হয়েছিল—এটা বলা যেতেই পারে।

রাজনৈতিক ভাবে ষাটের দশকের শেষার্ধে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই পার্টির মধ্যেই বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অবশ্য দুই কংগ্রেসই নীতিগত প্রশ্নে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিরোধী ছিল। কমিউনিস্টদের প্রথম ভাঙনে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা অবশ্য তখনই শিক্ষক সমিতি ত্যাগ করেনি। তবে দ্বিতীয় ভাঙনের উপজাত পার্টি নকশালরা সরাসরি 'সি পি এম'-এর দালাল' শিক্ষক সমিতির উপর আক্রমণ হানে। সন্তোষ ভট্টাচার্য, বিমল দাশগুপ্তের মতো নেতারা নিহত হলেন তাদের হাতে। এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব।

পরবর্তীকালে ‘নব কংগ্রেস’-এর সমাজবিরোধীরা নকশাল আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করে। ‘কংশাল’ নামে পরিচিত হয়। তাদের আক্রমণের শিকার হয়, শিক্ষকসহ সাধারণ মানুষ।

এসে গেল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। সত্যপ্রিয় রায়ের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির স্বাধীন অস্তিত্বের কফিনে শেষ পেরেক প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হল। শেষ পর্যন্ত চন্দননগরে সমিতির পঁয়তাল্লিশ তম অধিবেশন ও সুবর্ণ জয়ন্তীর বর্ষে, সমিতির মধ্যে ভাঙন ধরল। সি.পি.আই(এম) প্রভাবিত নিখিল বঙ্গের ছত্রছায়া পরিত্যাগ করে, এস.টি.ই.এ. নামে একটি পৃথক শিক্ষক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন বিরোধীরা। এখানে মনে রাখা দরকার ১৯৪৮-এ প্রধান শিক্ষক সমিতি গঠন ছাড়াও ১৯৫৪ এবং ১৯৬২তে সমিতির মধ্যে ভাঙন ধরলেও, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তার গণচরিত্র হারিয়ে ফেলেনি। উপরোক্ত পৃথক প্রতিষ্ঠানগুলি কংগ্রেসি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় টিমটিম করে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল মাত্র। কিন্তু ১৯৭১-এর পর থেকে মূল সমিতি ও তার দলছুট অংশগুলি ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড়ে পরিণত হল। সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও সব মত ও পথের শিক্ষকদের মিলিত মঞ্চ হিসাবে এ.বি.টি.এ. তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলল। প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষেই মূল শিক্ষক সমিতি তার মূলগত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলল এভাবেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা মূল প্রবন্ধে।

উপসংহারে ৭০-এর দশকে মূল ও শাখা প্রশাখায় বিভক্ত সমিতিগুলির কার্যকলাপের ধারা সম্বন্ধে সিংহাবলোকন করতে সচেষ্ট হয়েছি আমরা। একদিকে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অশনি সংকেত ও অন্যদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অশুভ প্রভাব শিক্ষক আন্দোলনে কি ছাপ রেখেছিল এই পর্যায়ে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি আমরা। পরবর্তী কালে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মসনদে আসীন হবার পর সরকার একদিকে যেমন শিক্ষকদের বহুতর দাবি মেনে নিল, তেমনি শিক্ষকেরাও শহরে ও গ্রামে বামপন্থী সরকারের ‘এজেন্ট’ হিসাবেই কাজ করতে শুরু করেছিল। সেই সময়কার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ ও পৌরসভায়, তাঁরাই বহুলাংশে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সরকারের মুখ। অন্যদিকে এতদিনকার শীতঘুম ভেঙে, অ-বাম শিক্ষক সংগঠনগুলি, বামফ্রন্ট সরকারের সার্বিক বিরোধিতা করতে শুরু করল। প্রাথমিক স্তরে ‘ইংরেজি’ তুলে দেওয়া ও পাশ-ফেল প্রথা রদ করার কিংবা শিক্ষকদের অবসরের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে ষাট করার প্রতিবাদে স্বোচ্চার হয়ে উঠল তাঁরা। এই ইস্যুতে লড়াই লেগে গেল, বিশেষ করে সি.পি.আই (এম) প্রভাবিত শিক্ষক সমিতি ও বিরোধী এমনকি সরকারের ছোটো শরিকদের প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠনগুলির মধ্যে। পাশার দান উল্টে গেল ১৯১১তে। আবার অ-মিত্র সরকারের বিরুদ্ধে ABTA স্বোচ্চার হতে শুরু করল। আর বিরোধী অনেক শিক্ষক সংগঠন শুরু করল স্তাবকতা। গড়ে উঠল অনেক নতুন নতুন শিক্ষক সংগঠন। এই ভাবে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক আন্দোলনের মহতি বিনষ্টি সম্পন্ন হল।

পরিশেষে ই. এইচ. কার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যেমন বলেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতেই পারি, ‘History can not

be written unless the historian can achieve some kind of contact with the mind of those about whom he is writing'। ইতিহাসের এক অকিঞ্চিৎকর ছাত্র হিসাবে প্রায় সিকি শতাব্দী শিক্ষকতার কাজে যুক্ত আছি। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি শিক্ষক সংগ্রামে সংযুক্ত থাকার। শিক্ষিকা মাতা ও মাতামহীর কাছে ছোটোবেলায় রূপকথার মতো শুনেছি শিক্ষক আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল অতীত দিনের কথা। এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই সাহস সঞ্চয় করেছি, শিক্ষক আন্দোলন সম্বন্ধে দু'চার কথা বলার। আশা করি একে কেউ 'দুঃসাহস' বলবেন না।

(প্রবাল সেনগুপ্ত)
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
হুগলী মহসিন কলেজ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কোলকাতা
....০১/২০২২

4.01.2022

অবেক্ষক ঃ

ASSISTANT PROFESSOR
DEPA[illegible]STORY
JADAV[illegible]SITY
KOLKATA - 700 032

(ড. দেবজিত দত্ত)
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

SOFTCOPY

Annexure-I

Jadavpur University

E-Thesis Metadata Form

•	Title	(দেশ-সামাজিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার সাম্যবাদী
•	Alternative Title, if any	বিপ্লবী নিরঞ্জন সেন [illegible] ও কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা (১৯২১-১৯৭১)
•	Name of Research Scholar	PRABAL SENGUPTA
•	Index Number (if any)	—
•	Date of Registration	29-07-2016
•	Name of Guide/Supervisor(s)	1. 2. 3. Dr DEBAJIT DUTTA, ASSISTANT-PROFESSOR, DEPTT OF HISTORY JADAVPUR UNIVERSITY
•	Name of Degree	Ph.D (Arts)
•	Name of Faculty	ARTS
•	Department/Centre	HISTORY
•	Name of affiliated Institution for which JU is granting the degree	—
•	Date of Submission	17-01-2022
•	Subject Keywords	1. নিরঞ্জন সেন [illegible] 2. [illegible] 3. মুক্তি [illegible] 4. [illegible] 5. আন্দামান বন্দিমুক্তি
•	Coverage (for time periods or spatial regions only) ✓	
•	Language of the thesis	BENGALI
•	File Format of thesis and accompanying material, if any (PDF, MPEG, etc.)	—

Annexure-II

Jadavpur University

Consent Form for Digital Archiving

Name of the Author (Research Scholar)	PRABAL SEN GUPTA
Registration Number	A00HI 1101216 (2016-17)
Index Number (if any)	—
Degree	Ph.D (Arts)
Faculty	ARTS
Department/Centre	HISTORY
School	—
Name of affiliated Institution for which JU is granting the degree	—
Guide/Supervisor(s)	Dr DEBAJIT DUTTA, ASSISTANT PROFESSOR, DEPTT OF HISTORY, J.U
Thesis/Dissertation Title	আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলার রাজনৈতিক চিত্রকলা বিজ্ঞাপনের এবং সমাজের আন্দোলন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা, (১৯২১-১৯৭১)
Date of Submission	17-01-2022

- I am the sole owner of copyright on this thesis. The Jadavpur University library is hereby granted, non-exclusive, royalty-free and non-transferable rights to make available, in full or in part without any modifications, this thesis in electronic/printed form for public use at no charge. Any use of material from this thesis/ dissertation must be accompanied with appropriate citation.

- I wish to allow open access to my thesis/dissertation.

Signature of the Scholar Prabal SenGupta
Place : KOLKATA
Date : 17-01-22